আল্লাহর আইন
ও
সৎ লোকের শাসন

অধ্যাপক গোলাম আযম

প্রকাশনা বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন
অধ্যাপক গোলাম আযম

প্রকাশক
অধ্যাপক মোঃ তাসনীম আলম
চেয়ারম্যান, প্রকাশনা বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
৫০৪, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারী-১৯৯২
সপ্তম প্রকাশ-

জুন- ২০০৬
জমা. আউয়াল-১৪২৭
জ্যৈষ্ঠ- ১৪১৩

কম্পোজ
সফটেক কম্পিউটার
বড় মগবাজার, ঢাকা।

মূল্য : নির্ধারিত ১২ (বার) টাকা মাত্র

মুদ্রণে
আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, বড় মগবাজার, ঢাকা।

প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশে ইকামতে দীন তথা ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে "আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন" জনগণের শ্লোগানে পরিণত হচ্ছে। ১৯৯১-এর নির্বাচনে জনগণের কাছে এটি ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয় শ্লোগান। প্রকৃতপক্ষে " আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন" এমন একটি মৌলিক বিষয় যার সুস্পষ্ট ধারণা ও জ্ঞানলাভ ইসলামী জনতার জন্য অপরিহার্য। শিক্ষিত জনগণ, এমনকি সাধারণ মানুষ এবং বিরোধী মহলেও এ জ্ঞান পৌঁছানো দরকার।

ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম এ বিষয়ের উপর বইটি রচনা করেছেন। তিনি যথাসম্ভব সহজ ও সাবলীল ভাষায় বইটিকে জনগণের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

বইটি ইসলামী বিপ্লবের জন্য যথেষ্ট সহায়ক হবে আশা করেই সম্মানিত পাঠকদের হাতে তুলে দিচ্ছি। আল্লাহ এ প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

আলোচনার বিষয়

া বইটির ইতিকথা ৯
া গোড়ার কথা ১১
া আইন কাকে বলে? ১৩

ন আইন দু' প্রকার ১৩
ন আইন নির্ভুল হয় না কেন? ১৪
ন নির্ভুল আইন কে দিতে পারে? ১৫
ন আলণ্ঢাহই একমাত্র সার্বভৌম সত্তা ১৬
ন আলণ্ঢাহর আইন মানে কি? ১৭
ন আলণ্ঢাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন ১৮
ন আলণ্ঢাহর আইনের উৎস ১৯
ন সৎ লোকের শাসন ছাড়া সব আইনই অচল ২০
ন আইনের শাসন২১

া সৎ লোক কাকে বলে? ২৩
ন সৎ লোক কোথায় পাওয়া যাবে? ২৪
ন সৎ লোক তৈরীর পদ্ধতি ২৪
ন মানুষ সৎ হতে চায় ২৫
ন সৎ লোকেরা যোগ্য হবার সুযোগ পাচ্ছে না ২৬

ন সৎ ও অসতে সংঘর্ষ অনিবার্য ২৬
ন ইসলামী আন্দোলনই অসৎ নেতৃত্বের একমাত্র চক্ষুশূল ২৭
ন সৎ লোক তৈরীর কর্মসূচি ২৮
ন সৎ লোকের শাসন ৩০
ন আলণ্ঢাহর আইনের সুফল ৩২

া ইসলামী সরকারের চার দফা দায়িত্ব ৩৪
া আলণ্ঢাহর আইনের পক্ষে গণদাবী চাই ৩৫
া যারা আলণ্ঢাহর আইন চায় তাদেরকে সংগঠিত হতে হবে ৩৬
া নির্বাচনের মাধ্যমেই ইসলামী সরকার কায়েম করতে হবে ৩৮
া জামায়াতে ইসলামীর সরকার কায়েম করতে হবে ৩৮

বইটির ইতিকথা

১৯৯১ সালের কথা। জামায়াতে ইসলামী রাজশাহী শহর অফিসে তদানীন্ড়ন জউঅ (জধলংযধযর উবাবষড়ঢ়সবহঃ অঁঃযড়ৎরঃু) এর চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার (১৯৯৬ সালে মেজর জেনারেল হিসেবে অবসর প্রাপ্ত) আইনুদ্দীন আমার সাথে দেখা করতে এলেন। বললেন, "আপনাদের শেণ্ঢাগান আল- াহর আইন ও সৎ লোকের শাসন" এর শেষাংশটি খুবই আকর্ষণীয়। আসলে সৎ লোকের শাসনের অভাবেই এত অশান্ড়ি ও বিশৃঙ্খলা। কিন্তু অনেকেই 'আলণ্ঢাহর আইন' কে বড় ভয় পায়। এত কঠোর শাস্ড়ি আর কোন আইনে নেই।

আমি বললাম, "আলণ্ঢাহর আইন মানে শুধু ফৌজদারী আইন নয়। মানুষকে সৎ বানাবার আইন, মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরনের আইন, অভাবের কারণে যেন অপরাধ করতে বাধ্য না হয় সে ব্যবস্থার আইন, বিবেকের বির"দ্ধে চলার মতো সুযোগ যাতে না থাকে তেমন পরিবেশ সৃষ্টির আইন ইত্যাদি চালু করার পরও কেউ কু-স্বভাবের বশবর্তী হয়ে অপরাধ করলে ইসলাম এমন কঠোর শাস্ড়ির আইন দিয়েছে যাতে মানুষ অপরাধ করার সাহসই না পায়।"

ব্রিগেডিয়ার সাহেবের ঐ কথা শুনবার পরই আমি এ বইটি লেখা প্রয়োজন মনে করলাম। সে হিসেবে এ বইটি রচনায় তাঁর পরোক্ষ অবদান অবশ্যই রয়েছে।

আলণ্ঢাহ পাক সবাইকে আলণ্ঢাহর আইনের গুর"ত্ব উপলব্ধির তাওফীক দান কর"ন এবং আলণ্ঢাহর আইন চালু করার মহান উদ্দেশ্যে আন্দোলন করার হিম্মৎ দান কর"ন।

আলণ্ঢাহর আইন আমাদের দেশে নেই। যে আইনই আছে তাতে মানুষ কিছুটা হলেও নিরাপত্তা বোধ করতে পারত যদি শাসকরা সৎ লোক হতো। প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী থেকে থানার দারোগা-পুলিশ পর্যন্ড় যারা দেশ শাসন করছেন তারা যে শিক্ষা ব্যবস্থায় গড়ে উঠেছেন সেখানে নৈতিকতা ও সততা শিক্ষা এবং বিবেককে লালন করার কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। এ কারণেই সৎ লোকের শাসন থেকে দেশ বঞ্চিত।

বিনা পরিকল্পনায় বাগান তৈরী হয় না। জঙ্গল আপনা আপনিই তৈরী হতে পারে। তেমনি সৎ লোক এমনিতেই গড়ে উঠে না। যে বিবেকের বির"দ্ধে চলে না সেই সৎ লোক। আলণ্ঢাহর ভয় ও আখিরাতে জওয়াবদিহির অনুভূতিই মানুষকে সৎ বানায়। এটা অবিরাম প্রশিক্ষণের বিষয়। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এর কোন কর্মসূচি নেই। দেশ পরিচালনার দায়িত্বশীলদের মধ্যে এ বিষয়ে কোন চিন্ড়া ভাবনাই আছে বলে মনে হয় না। এটা সত্যি ভয়ানক উদ্বেগের কারণ।

অপরাধ দমনের জন্য থানায় দারোগা-পুলিশ রয়েছে। এরাই যদি অপরাধ প্রবণ হয় তাহলে অপরাধ দমন করবে কে? এরা যদি ভেতর থেকে সৎ না হয় তাহলে উপায় কী? বেড়া-ই যদি ক্ষেত খায় তাহলে রক্ষা করবে কে? তাই শাসন ক্ষমতা সর্ব পর্যায়ে এমন লোকদের হাতেই থাকা প্রয়োজন যারা বিবেকের বির"দ্ধে চলবে না।

তাই দেশ গড়ার উদ্দেশ্যে জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ছাত্র শিবির, ইসলামী ছাত্রী সংস্থা ও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সৎ লোক গড়ার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আলণ্ঢাহ পাক এ দেশে সৎ লোকের শাসন কায়েমের এ প্রচেষ্টাকে সফল কর"ন।

গোড়ার কথা

সব দেশে ও সব কালেই সমাজের সব স্ড়রে আইন ও শাসনের দরকার বলে সবাই স্বীকার করে। স্বামী ও স্ত্রী মিলে মাত্র দু'জন লোকের যে ক্ষুদ্র সমাজ 'পরিবার' নামে পরিচিত- সেখানেও উভয়কে কতক নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয় এবং একজনকে শাসকের ভূমিকা পালন করতে হয়। রাষ্ট্র হলো সবচেয়ে বড় ও সংগঠিত সমাজ। আইন-কানুন ছাড়া কোন রাষ্ট্র চলতেই পারে না। আর যেহেতু আইন নিজেই চালু হতে পারে না, সেহেতু শাসন ব্যবস্থা অবশ্যই দরকার।

আইন যদি সুবিচারমূলক ও নিরপেক্ষ না হয়, তাহলে সমাজে যুলুম ও অবিচার চলে। কিন্তু আইন যত ভালই হোক, যদি শাসকগণ সৎ না হয়, তাহলে আইনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। শাসক অসৎ হলে একটি

ভাল আইনও অন্যায়ের হাতিয়ারে পরিণত হয়। দুর্নীতি দমনের আইন দুর্নীতিবাজ অফিসারের মাধ্যমে চালু হতে পারে না। সে ঐ আইনের সুযোগ নিয়ে আরও বড় ধরনের দুর্নীতি চালু করে।

আমাদের দেশে খুন ও ডাকাতি দমনের উদ্দেশ্যে আইন আছে। কিন্তু দুর্নীতিপরায়ণ দারোগা, পুলিশ ও প্রশাসক ঐ আইন চালু না করে খুনী ও ডাকাতদের মুর"ব্বীর ভূমিকা পালন করলে ঐ আইন অচল হতে বাধ্য।

আইনের মধ্যে ফাঁক-ফোকড় ও দোষ-ত্র"টি থাকলেও শাসক যদি সৎ হয়, তাহলে মানুষ মোটামুটি ইনসাফ পেতে পারে। আর যদি আইন ত্র"টিমুক্ত হয় এবং শাসকও সৎ হয়, তাহলে তো সোনায় সোহাগা। তাই ভাল আইন ও সৎ শাসনের দাবী সব মানুষেরই প্রাণের দাবী। অথচ মানব সমাজে এ দুটোর অভাবই সবচেয়ে বেশী। বিশেষ করে সৎ লোকের শাসনের অভাব মানব জাতির সবচেয়ে বড় সমস্যা।

মানুষ জন্মগতভাবে অসৎ হয়ে পয়দা হয় না, একথা ঠিক। কিন্তু কোন মানুষই আপনা আপনি সৎ হয়ে গড়ে উঠতে পারে না। সে যে মানের পরিবার, সমাজ ও পরিবেশে ছোট থেকে বড় হয় সে মানেই সে গড়ে উঠে। বিনা পরিকল্পনায় সৎ লোক গড়া সম্ভব নয়। এক খন্ড জমি নিজে নিজে একটা জংগলে পরিণত হয়। সেখানে ফুল বা ফলের বাগান বিনা পরিকল্পনায় গড়ে উঠবে না।

সব মানুষই সুখে-শান্ড়িতে থাকতে চায়। ভাল আইন ও সৎ লোকের শাসন ছাড়া এ আশা পূরণ হতে পারে না। তাই এ বিষয়টা প্রত্যেকের সবচেয়ে জর"রী চাহিদা। কিন্তু দুনিয়ায় এরই সবচেয়ে বেশী অভাব। জ্ঞান-বিজ্ঞানের যতটুকু উন্নতি হয়েছে, তাতে এ অভাব পূরণের বদলে আরও বেড়ে গেছে। তাই ঠান্ডা মাথায় এ সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করা কর্তব্য।

আইন কাকে বলে?

দেশকে নিয়ম-শৃংখলার সাথে পরিচালনার জন্য যে বিধি-বিধান দরকার তাকেই আইন বলা হয়। কিন্তু এ আইন কোথায় পাওয়া যায়? আইনের সর্বসম্মত সহজ সংজ্ঞা হলো- খধি রং ঃযব রিষষ ড়ভ ঃযব ংড়াবৎবরমহ সার্বভৌম সত্তার ইচ্ছাই আইন। এর সহজ অর্থ হলো, দেশে চূড়ান্ড় ফয়সালা দেবার ক্ষমতা যার হাতে আছে, তার যা মর্জি তা-ই আইনের মর্যাদা পায়। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, ক্লাব, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির পরিচালকগণ যে সব বিধি-বিধান রচনা করেন তা আইনের মর্যাদা পায় না। দেশের আইন ঐ সব প্রতিষ্ঠানের কোন বিধানকে বে-আইনী ঘোষণা করতে পারে। আইন ঐসব বিধানকে বলা হয়, যা দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার মালিক রচনা করে। বর্তমান যুগে জনগণকেই রাষ্ট্রের মালিক বলে স্বীকার করা হয়। তাই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা যে আইন সভা গঠিত হয় এর হাতেই দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতা আছে বলে মেনে নেয়া হয়। এ কারণেই এর নাম দেয়া হয়েছে খবমরংষধঃঁৎব বা আইন পরিষদ। এ ধরনের সংস্থার ইচ্ছাই আইন। বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ আইন রচনার এ দায়িত্ব পালন করে থাকে।

আইন দু'প্রকার

সাধারণভাবে আইনকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। দেশের শাসনতন্ত্রকে মৌলিক আইন বলা হয়। আইন পরিষদ যত সহজে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোন আইন পাস করতে পারে, তত সহজে শাসনতন্ত্রের কোন আইন বদলাতে পারে না। এ হিসাবে আইন দু'প্রকারঃ মৌলিক ও সাধারণ।

মৌলিক আইন বা শাসনতন্ত্র জনগণের প্রতিনিধিরাই রচনা করেন বটে, কিন্তু এ আইন পরিবর্তন করতে হলে আইন সভার তিন ভাগের দু'ভাগ সদস্যের সমর্থন দরকার। কিন্তু সাধারণ আইন শতকরা ৫১ জনের সমর্থনেই পাস হতে পারে।

শাসনতন্ত্রের এ মর্যাদা রয়েছে যে, এর বিরোধী কোন আইন পাস করার ক্ষমতা আইন সভারও নেই। তেমনিভাবে আইন সভার রচিত কোন বিধানের বিরোধী কোন বিধি দেশের আর কোন প্রতিষ্ঠান রচনা করলে তা বাতিল বলে গণ্য হয়। শাসনতন্ত্রই হলো দেশের বুনিয়াদী আইন। আইন পরিষদকেও শাসনতন্ত্রের আনুগত্য করতে হয়। আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ শাসনতন্ত্র অনুযায়ীই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য। অবশ্য শাসনতন্ত্রের বিরোধী নয় এমন যে কোন আইন তৈরী করার ক্ষমতা আইন সভার রয়েছে।

আইন নির্ভুল হয় না কেন?

মৌলিক আইনই হোক আর সাধারণ আইনই হোক, সব আইনই জনগণের স্বার্থের সাথে জড়িত। আইনই নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করে। তাই আইনে যদি ভুল বা ত্রুটি থাকে, তাহলে জনগণকেই এর মাসুল দিতে হয়। তাই আইন এমন হতে হবে যাতে সব নাগরিকের নৈতিক সমর্থন এর পক্ষে থাকে। তবেই মানুষ মনের তাকিদেই আইন মেনে চলবে।

কয়েকটি কারণে আইনে ভুল-ত্রুটি থাকে ঃ

১। যারা আইন রচনা করে, তারা যদি সব মানুষের কল্যাণের বদলে কোন গোষ্ঠী বা শ্রেণীর স্বার্থে আইন তৈরী করে। যেমন বৃটিশ শাসনামলে মুসলিম জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে জমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ড়ের আইন তৈরী করা হয়েছিল।

২। যদি দেশের বেশীর ভাগ লোকের ঈমান-আকীদা বিরোধী আইন তৈরী করা হয়। যেমন ১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে ধর্ম- নিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রকে এদেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।

৩। যাদের হাতে সরকারী ক্ষমতা রয়েছে, তারা যদি জনগণের ইচ্ছার বির"দ্ধে শক্তি বলে ক্ষমতায় টিকে থাকার বদ নিয়তে কোন আইন রচনা করে। যেমন ১৯৭৪ সালে দেশের নিরাপত্তার নামে বিনা বিচারে সরকারবিরোধী লোকদেরকে জেলে আটকে রাখার উদ্দেশ্যে আইন করা হয়েছিল এবং ১৯৭৫ সালে একদলীয় শাসন কায়েম করে বিরোধী সব দলকে বে-আইনী করা হয়েছিল।

৪। সঠিক জ্ঞানের অভাবেও ক্ষতিকর আইনকে ভাল মনে করে রচনা করা হয়ে থাকে। যেমন সাম্যবাদের দোহাই দিয়ে এক সময় রাশিয়ায় মার্কসবাদের ভিত্তিতে দেশ গড়ার আইন রচনা করা হয়েছিল। ঐ আইনের ভুল বুঝতে পেরে রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের জনগণ বর্তমানে এর বির"দ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত হয়েছে।

৫। এক সময় যে আইন ভাল বলে চালু করা হয় পরবর্তী কালে অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণ হয় যে তা ভুল ছিল। যেমন আইয়ুব খান ১৯৬২ সালে বুনিয়াদী গণতন্ত্রের নামে শাসন ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। কয়েক বছর পরই এর ভুল বুঝতে পেরে তিনি তা বদলাতে রাযী হয়ে গেলেন।

এ সব ঘটনা প্রমাণ করে যে, গোষ্ঠী স্বার্থ, আদর্শিক বিচার, সঠিক জ্ঞানের অভাব, ভবিষ্যতের পরিণাম না জানা এবং অন্যায়ভাবে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার কারণেই যুগে যুগে দেশে দেশে নির্ভুল আইন রচনা করা সম্ভব হয়নি।

নির্ভুল আইন কে দিতে পারে?

নবী ও রাসূলগণ এবং তাঁদের সত্যিকার অনুসারিগণ মানব জাতিকে এ কথাই বুঝাবার চেষ্টা করে গিয়েছেন যে, আলণ্ঢাহ ছাড়া আর কেউ নির্ভুল আইন দিতে পারে না। কারণ ঃ

১। একমাত্র তিনিই সব কালের জ্ঞান রাখেন এবং ভবিষ্যতের পরিণাম জানেন।

২। একমাত্র তিনিই নিঃস্বার্থ এবং নিরপেক্ষ। তাই তাঁর আইন ছাড়া সত্যিকার ইনসাফ পাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

৩। তিনি অন্যায়, অবিচার ও যুলুম পছন্দ করেন না বলেই তাঁর আইন কোন গোষ্ঠীকে ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার সুযোগ দেয় না।

এ কারণেই প্রায় দেড় হাজার বছর আগে আলণ্ঢাহ পাক মানুষের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন, এমন কি আ"ড়র্জাতিক ক্ষেত্রের জন্য কুরআনুল হাকীমে যে সব আইন দিয়েছেন এবং রাসূল (সা.) ঐ সব আইন বাস্ড়বে মানব সমাজে চালু করে যেভাবে ঐ সব আইনের কল্যাণকর হওয়া প্রমাণ করে গেছেন, তার ফলে আজ গোটা বিশ্বে আলণ্ঢাহর আইনের পক্ষে জোরদার আন্দোলন গড়ে উঠেছে।

ফেরআউন ও নমরূদ থেকে আরম্ভ করে এ যুগের হিটলার ও মুসোলিনীদের রচিত আইন কোন দেশেই নতুন করে চালু করার আন্দোলন গড়ে উঠেনি। রাশিয়ায় কমিউনিজমের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর আর কোন দেশে এর পক্ষে আন্দোলন নতুন করে দানা বাঁধবে না।

কিন্তু আলণ্ঢাহর আইনের পক্ষে আন্দোলন কোন কালেই বন্ধ হয়নি এবং কেয়ামত পর্যন্ড় বন্ধ হবে না। যারা নৈতিক জীব হিসাবে মানুষের উন্নয়ন কামনা করে, যারা প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মানব জাতিকে উদ্ধার করতে আগ্রহী, সব মানুষের ন্যায্য অধিকার বহাল করে যারা দুনিয়ায় শান্ড়ি কায়েম করতে চায়, তারা সব দেশে সব কালেই আলণ্ঢাহর আইন চালু করার আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

আর যারা নিজেদের নৈতিক সত্তাকে পঙ্গু করে রেখে দুনিয়ার রূপ-রস-গন্ধের মজা লুটবার চেয়ে বড় কোন উদ্দেশ্য জীবনে পোষণ করে না, তারা আলণ্ঢাহর আইনকে তাদের স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী মনে করবেই।

আল- াহই একমাত্র সার্বভৌম সত্তা

"সার্বভৌম সত্তার ইচ্ছাই আইন" -এ কথাটি বাস্ড়ব সত্য হলেও রাষ্ট্র বিজ্ঞানে সার্বভৌমত্ব কোথায় আছে (খড়পধঃরড়হ ড়ভ ঝড়াবৎবরমহঃু) সে বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে। সার্বভৌম শক্তি কি জনগণের হাতে, না পার্লামেন্টের হাতে- এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর প্রখ্যাত রাষ্ট্র বিজ্ঞানী প্রফেসর হেরলড জে লাস্কী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "গ্রামার অব পলিটিক্স"- এ শেষ পর্যন্ড় সিদ্ধান্ড় দিয়েছেন যে, সার্বভৌম শক্তির অস্ড়িত্ব আসলেই অনুপস্থিত।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সার্বভৌম সত্তার যে সব বৈশিষ্ট্য সবাই স্বীকার করে নিয়েছেন, তা বাস্ড়বে কোথাও নেই। যুক্তির ধোপে একথা টিকে না যে জনগণ, পার্লামেন্ট বা কিং সার্বভৌম শক্তির ধারক। কারণ এদের কেউ চিরস্থায়ী, সর্বব্যাপী, অবিভাজ্য, অহস্ড়ান্ড়রযোগ্য, অবিমিশ্র ও চরম স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা প্রয়োগে সক্ষম নয়। অথচ এ সবকেই সার্বভৌম সত্তার বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকার করা হয়।

সত্যিকার বিশেণ্ডষণে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, ঐ সব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী একমাত্র আলণ্ডাহ তায়ালারই মধ্যে পাওয়া যায়। আয়াতুল কুরসীতে আলণ্ডাহর মধ্যেই ঐ সব গুণাবলী রয়েছে বলে উলেণ্ডখ করা হয়েছে।

আলণ্ডাহর আইনকে সার্বভৌম সত্তার ইচ্ছা হিসাবে মেনে নিলে পার্লামেন্টেরও আলণ্ডাহর আইনের বির"দ্ধে কোন আইন রচনা করার অধিকার থাকে না।

"সার্বভৌম সত্তা কোথায় আছে"? অর্থাৎ (খড়পধঃরড়হ ড়ভ ঝড়াবৎবরমহঃু) নামে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যে সমস্যা আছে এর একমাত্র সমাধান হচ্ছে আলণ্ডাহর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে নেয়া। সার্বভৌমত্ব নেই বললে এ সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়া হয় মাত্র।

আলণ্ডাহর আইন মানে কী?

ইসলাম বিরোধীদের কুপ্রচারণার ফলে সাধারণভাবে এ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, আলণ্ডাহর আইন মানে চোর-ডাকাতের হাত কাটা, যিনাকারকে সংগেসার (পাথর মেরে হত্যা) করা, মদখোরকে বেত মারা, সুদখোরকে জেলে দেয়া ইত্যাদি। সমাজে চুরি-ডাকাতি, যিনা, মদ, সুদ, জুয়া ইত্যাদি ব্যাপক হওয়ায় বহু লোক এ সব মন্দের সাথে জড়িত। তাই ইসলাম বিরোধীরা এ সব লোককে আলণ্ডাহর আইন কায়েমের বির"দ্ধে সংগঠিত করার হীন উদ্দেশ্যেই এ অপপ্রচার চালায়।

অথচ আলণ্ডাহর আইনের উদ্দেশ্য হলো সমাজকে এমনভাবে গঠন করা যাতে জনগণের মন-মগজ-চরিত্র আল- াহর হুকুম ও রাসূল (স.)-এর তরীকা মতে জীবন যাপনের সুযোগ পায়। মানুষ ভাত, কাপড়, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির অভাবে যেন অসৎ পথে চলতে বাধ্য না হয়। বিয়ে ছাড়া যেন নারী-পুর"ষের অবৈধ মিলনের কারণ ও সুযোগ না ঘটে। যে সব কু-অভ্যাস সমাজে অশান্ড়ি সৃষ্টি করে, তা থেকে জনগণকে যাতে রক্ষা করা যায়।

সাধারণ শিক্ষা, বিশেষ শিক্ষা, প্রচার ও গণশিক্ষার মাধ্যমে জনগণকে আলণ্ডাহর দাসত্ব ও রাসূলের আনুগত্য করার যোগ্য বানানোই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব। জনগণের মৌলিক প্রয়োজন যাতে পূরণ হয় এবং মানুষ যাতে অভাবের কারণে কুপথ বেছে না নেয়, সে ব্যবস্থা করাও সরকারের কর্তব্য। হালাল পথে রোযগার করার সুযোগ দান করে হারাম পথ বন্ধ করাও সরকারেরই দায়িত্ব।

আলণ্ডাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন

সূরা আল হাজ্ব-এর ৪১নং আয়াতে ইসলামী রাষ্ট্রের যে ৪ দফা কর্মসূচি দেয়া হয়েছে তাতে সমাজ এমন ভাবে গড়ে উঠবে যাতে মানুষ নৈতিক দিক দিয়ে উন্নত ও বস্তুগত দিক দিয়ে সচ্ছল হয়। ফলে এমন পরিবেশ সৃষ্টি হবে যে স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষ অপরাধ করবেনা।

এত সব ব্যবস্থার পরও যারা চুরি-ডাকাতি, যিনা, মদ, ঘুষ, জুয়া ইত্যাদি সমাজ বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়, তাদের জন্য কুরআন কঠোর শাস্ড়ির বিধান দিয়েছে যাতে মানুষ এ সব কুকর্মের সাহস না পায়। এ সব ঘৃণ্য কাজ ছাড়া যারা দুনিয়ার জীবনটা নিরস মনে করে তারাই ইসলামের ফৌজদারী আইনকে 'বর্বর' বলতে পারে।

কুরআনের কঠোর ফৌজদারী আইনের উদ্দেশ্য সমাজে হাত কাটা লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা নয়। বরং যাতে হাত কাটার প্রয়োজনই না হয় এমন সমাজ গড়াই এর লক্ষ্য।

জনগণের চরিত্র গঠনের ব্যবস্থা এবং মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের বন্দোবস্ড় করার জন্য আল- াহ তা'আলা যে সব আইন দিয়েছেন, তা সমাজে জারী না করে শুধু শাস্ড়ি দেবার আইন জারী করার অধিকার কোন সরকারের নেই।

কোন লোককে কাতুকুতু দিয়ে হাসতে বাধ্য করার পর তাকে হাসার জন্য দোষী সাব্যস্ড় করা যেমন হাস্যকর, তেমনি নারী-পুর"ষের অবাধ মেলা-মেশার সুযোগ সৃষ্টি করে এবং যৌন উত্তেজনাকর পত্র-পত্রিকা ও সিনেমার ব্যাপক প্রসারের ব্যবস্থা করে যিনার শাস্ড়ি দেয়াও চরম অবিচার। অভাবের কারণে কেউ চুরি করেছে বলে প্রমাণিত হলে তাকে শাস্ড়ি দেবার অধিকার ইসলাম দেয়নি।

ইসলামী আইন এমন সুন্দর সমাজ কায়েম করার জন্যই দেয়া হয়েছে যেখানে সবাই নিরাপত্তা বোধ করবে এবং সুখে-শান্ড়িতে বসবাস করার সুযোগ পাবে। সত্যিকার ইনসাফ কায়েম করাই আলণ্ঢাহর আইনের আসল উদ্দেশ্য বলে সূরা হাদীদের ২৫ নং আয়াতে আলণ্ঢাহ পাক ঘোষণা করেছেন।

ঐ আয়াতের মিযান শব্দটি থেকেই জামায়াতে ইসলামী দাঁড়ি পালণ্ঢাকে দলীয় প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করেছে। কারণ দাঁড়ি পালণ্ঢা ইনসাফ বা সুবিচারের প্রতীক হিসাবে সারা দুনিয়ায় পরিচিত।

আলণ্ঢাহর আইনের উৎস

আলণ্ঢাহর আইনের মূল উৎস আলণ্ঢাহ নিজেই। এমন কোন আইন আলণ্ঢাহর আইন বলে গণ্য হতে পারে না, যা আলণ্ঢাহর কাছ থেকে আসেনি। এ মূলনীতির ভিত্তিতে আলণ্ঢাহর আইনের উৎস কয়েকটি রয়েছে ঃ

১। কুরআনই হলো আলণ্ঢাহর আইনের প্রধান উৎস। কারণ কুরআনের ভাব ও ভাষা সবই আলণ্ঢাহর পক্ষ থেকে রাসূল (সা.) এর উপর নাযিল হয়েছে।

২। রাসূলের সুন্নাহ হলো দ্বিতীয় প্রধান উৎস। আলণ্ঢাহর পক্ষ থেকে আলণ্ঢাহর ওহীর ভিত্তিতে রাসূল (সা.) তাঁর কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে কুরআনের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তারই নাম সুন্নাহ। একমাত্র সুন্নাহই কুরআনের সরকারী, সঠিক ও নির্ভুল ব্যাখ্যা।

৩। আছারে সাহাবা হলো আলণ্ঢাহর আইনের তৃতীয় উৎস। খোলাফায়ে রাশেদীন রাসূল (সা.) -এর প্রতিনিধি হিসাবে ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজকে পরিচালনা করতে গিয়ে যে বাস্ড়ব শিক্ষা রেখে গেছেন, তা অনুসরণযোগ্য বলে রাসূল (সা.) স্বয়ং সার্টিফিকেট দিয়ে গেছেন। এ ছাড়াও কুরআনের ব্যাখ্যা হিসাবে সাহাবা কিরাম (রা.) থেকে যতটুকু জ্ঞান হাদীসে পাওয়া যায়, তা অবশ্যই গুর"ত্বের দাবী রাখে।

৪। এ কয়টি উৎসকে ভিত্তি করে ফিকাহর ইমামগণ ইসলামী আইনের যে বিপুল সম্পদ রেখে গেছেন, তা চিরকালই ইসলামী আইন রচনার নির্ভরযোগ্য সহায়ক।

ফিকাহর ইমামগণ যে সব বিষয়ে একমত হয়েছেন, তাকেও উৎস হিসাবে মর্যাদা দেয়া হয়। ইসলামী পরিভাষায় এর নাম হলো ইজমা।

আলণ্ঢাহর আইনের এ চারটি উৎসকে মেনে নিয়ে কোন আইন সভা যদি আইন রচনা করে, তাহলে তা ইসলামী আইন বলে গণ্য হতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্রের আইন সভার এটাই দায়িত্ব। এই আইন সভার এমন কোন আইন রচনার অধিকার নেই, যা কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধী বলে সাব্যস্ড় হয়। কোন আইন

কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কিনা তা সাব্যস্ড় করার জন্য ইসলামী আইনে পারদর্শী বিশেষ সংস্থা থাকতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের একটি ডিভিশনের উপরও এ দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।

সৎ লোকের শাসন ছাড়া সব আইনই অচল

আলণ্ডাহর আইন আমাদের দেশে নেই। কিন্তু যে আইনই আছে তাও ঠিক মতো জারী হচ্ছে না। এর আসল কারণই হলো অসৎ লোকের শাসন। কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

১। যাদের আয় মোটামুটি বেশী, তাদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট হারে আয়কর নেবার অধিকার সরকারকে দিয়ে আইন রচনা করা হয়েছে। কিন্তু যে পরিমাণ আয়কর সরকারী তহবিলে জমা হওয়া উচিত তা হয় না। কারণ আয়কর অফিসের কর্মচারীরা করদাতার দেয়া আয়ের হিসাব সত্য বলে বিশ্বাস না করে করের পরিমাণ কয়েকগুণ বেশী ধার্য করে দেয়। এর ফলে করদাতারা সত্য হিসাব না দিয়ে আসল আয়ের অনেক কম দেখায়। এ অবস্থায় এক শ্রেণীর আয়কর উকীল করদাতা ও অফিসারের মাঝখানে দালালী করে মীমাংসায় পৌঁছায়ে দেয়। এ মীমাংসার ফলে সরকারী তহবিলে আয়কর যে পরিমাণ জমা হওয়া উচিত এর চেয়ে কম জমা হয়। আর অন্যায়ভাবে করদাতা, আয়কর অফিসার ও দালাল অবৈধভাবে লাভবান হয়। অফিসার ঘুষ নিয়ে করদাতার মিথ্যা হিসাব সত্য বলে মেনে নেয়। করদাতা ঘুষ দিয়ে ন্যায্য আয়করের এক অংশ কম দিয়ে বেঁচে যায়। আর উভয় পক্ষকে অবৈধ কাজে সাহায্য করার ফীস বাবদ দালালও রোযগার কামাই করে নেয়।

এখানে সরকারী অফিসারই এক নম্বর দোষী। ব্যক্তিগত স্বার্থে সে সরকারী দায়িত্বে অবহেলা করে। যদি করদাতারা সঠিক হিসাব দেয় এবং অফিসাররা ঘুষ না খায়, তাহলে আয়করের হার অনেক কম হলেও সরকারী আয় যথেষ্ট হতে পারে।

২। ইউনিয়নের উন্নয়নের জন্য সরকার গম, চাউল, টাকা ইত্যাদি বরাদ্দ করে। যে অফিস থেকে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে এ সব জিনিস সরবরাহ করা হয়, সে অফিসের কর্মচারীরা এ সব জিনিস বিলি করার সময় যদি বিশেষ হারে ঘুষ আদায় করে, তাহলে আইনমত চেয়ারম্যান যে পরিমাণ জিনিস ও টাকা পাওয়ার কথা তা থেকে কম নিতে বাধ্য হয়। যদি অফিসাররা চুরি করা শিক্ষা দেয় তাহলে চেয়ারম্যানরাও দুর্নীতি করার সাহস পায়।

৩। আইনে আছে যে, খুনীকে শাস্ড়ি দিতে হবে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দারোগা, পুলিশ ও ম্যাজিষ্ট্রেটকে ঘুষ দিয়ে খুনী বেঁচে যায়। অথচ কত নির্দোষ লোক খুনের মিথ্যা মামলায় জেলে পড়ে আছে। এটাও ঘুষের কেরামতী।

উদাহরণের বেশী দরকার নেই। দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও ঘুষের রাজত্ব সর্বত্র। আইন চালু করা যাদের দায়িত্ব, তারাই যদি অসৎ হয় তাহলে কোন আইনই কাজে আসে না। সৎ লোকের অভাবে আজ মানুষ আইনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

আইনের শাসন

আইন থাকা সত্ত্বেও আইনের সঠিক ব্যবহার না হলে এর সুফল পাওয়া যায় না। আইন আছে অথচ শাসকদের মনগড়া শাসন চলে। তাই আইন যাতে শাসকের ভূমিকা পালন করতে পারে এর ব্যবস্থা প্রয়োজন। এরই নাম আইনের শাসন।

আইনের দাবী হলো ঃ

১। সবার উপর আইন সমানভাবে প্রয়োগ করতে হবে। সরকারী পদস্থ লোক আইনের নাগালের বাইরেই থাকতে চেষ্টা করে। তাই সে অন্যায় করেও শাস্ড়ি পায় না। সাধারণ লোক সহজেই শাস্ড়ি

পায়। এটা আইনের শাসন নয়। আইনের চোখে সবাই সমান হতে হবে। রাষ্ট্র প্রধানও যেন আইনের ঊর্ধ্বে না থাকে।

২। আইন অনুযায়ী পরিচালিত আদালতে দোষী সাব্যস্ড় না হওয়া পর্যন্ড় প্রত্যেক মানুষই নির্দোষ। বিনা বিচারে আটক করা বা শাস্ড়ি দেয়া আইনের শাসন নয়।

আইনের শাসন কায়েম করতে হলে সৎ লোকের শাসন প্রয়োজন। আইন নিজে নিজে জারী হতে পারে না। যারা আইন জারী করার দায়িত্বে আছে তাদেরকেই শাসক বলে। শাসক যদি অসৎ হয়, তাহলে আইন সঠিক নিয়মে জারী হবে না। অসৎ শাসক আইনকে ফাঁকি দিয়ে বেআইনীভাবেই শাসন করার অপচেষ্টা করে থাকে।

খোলাফায়ে রাশেদীন যেভাবে নিষ্ঠার সাথে আইন জারী করেছেন ঐ আইন বহাল থাকা সত্ত্বেও পরবর্তী যুগে সব শাসক সমান মানে আইন জারী করেননি।

আমাদের দেশে শাসকদেরকেই প্রধান আইন ভঙ্গকারীর ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। এ অবস্থায় আইনের শাসন কায়েম হতে পারে না।

সবচেয়ে বড় সত্য কথা হলো যে, দুর্নীতি উপর থেকেই 'নাযিল' হয়। সরকারী ক্ষমতা যাদের হাতে, তারা সৎ হলে নীচের দিকে ক্রমে সততা চালু করা সহজ হয়। আজ দুর্নীতি ব্যাপক হবার মূল কারণ এটাই যে, সরকার পরিচালকরা বহু বছর থেকে এ বিষয়ে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে।

তাই সততা চালু করতে হলে নীচ থেকে শুর" করা সম্ভব নয়। সরকার পরিচালনার প্রধান নেতৃত্ব সৎ না হওয়া পর্যন্ড় দুর্নীতি কোথাও বন্ধ করা যাবে না। প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রীগণ এবং জাতীয় সংসদের সদস্যগণ যদি সত্যিকার সৎ ও চরিত্রবান হন, তাহলে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে উপর থেকে নীচ পর্যন্ড় সততা চালু করা সম্ভব। সৎ লোকের চারিত্রিক প্রভাবে অধীনস্ড় লোকেরা সৎ হবার প্রেরণা পায়। মানুষ সহজাতভাবেই নৈতিক জীব। নীতিবান লোকের হাতে নেতৃত্ব থাকলে এর সুফল নীচের দিকেও দেখা যায়।

সৎ লোক কাকে বলে?

সমাজে সৎ লোকের বড়ই অভাব। কিন্তু যারা সৎ নয়, তারাও সৎ লোককে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করে। কোন চোর তার চুরির মাল আর এক চোরের কাছে আমানত রাখে না, কোন সৎ লোকের কাছেই রাখে। অসৎ লোকও সৎ লোকের প্রশংসা করে। তারা নিজে অসৎ হলেও সততা কী তা জানে।

আলণ্ঢাহ পাক মানুষকে ভাল ও মন্দের পার্থক্য বুঝবার যোগ্যতা দিয়েছেন। এ যোগ্যতা আর কোন জীব-জানোয়ারের নেই। এরই নাম বিবেক। বিবেকই আসল মানুষ। এটাই মানুষের নৈতিক সত্তা। মানুষের দেহ হলো বস্তুসত্তা। দেহের ভাল-মন্দের কোন ধারণা নেই। দেহের যা দাবী সে তা পেলেই খুশী। তা সে হালাল পথে পেল কিনা সে হিসাব সে করে না। বিবেকই সে হিসাব করে। কুরআন পাক এর নামই দিয়েছে রূহ আর দেহের দাবীগুলোকে নাফস বা হাওয়া নাম দিয়েছে।

সব মানুষই এ কথার সাক্ষী যে, রূহ ও নাফসের মধ্যে হামেশাই লড়াই চলছে। ভাল-মন্দ বিচার না করে নাফস সব কিছুই চায়। বিবেক ভাল-মন্দ বিচার করে মন্দের ব্যাপারে বাধা দেয়। যার বিবেক দুর্বল সে নাফসকে মন্দ থেকে ফিরাতে পারে না। এদেরকে অসৎ লোক বলা হয়। যাদের বিবেক সবল তারাই সৎ লোক। তারা নাফসকে দমন করতে চেষ্টা করে।

তাহলে একথা প্রমাণিত হলো যে, সৎ লোক তারাই, যারা বিবেকের দ্বারা পরিচালিত। অর্থাৎ

১। তারা বিবেকের বির"দ্ধে চলে না।

২। যেটাকে ঠিক মনে করে নাফসকে তা করতে বাধ্য করে।

৩। মুখে যা স্বীকার করে বাস্ড়বে তা পালন করে।

৪। কারো ভয়ে বা ভালবাসার কারণে অন্যায় করে না।

৫। কখনও বিবেকের বির"দ্ধে কিছু করলে অনুতাপ করে এবং আর এমন করবে না বলে সিদ্ধান্ড় নেয়। এরই নাম তাওবা।

সৎ লোক কোথায় পাওয়া যাবে?

সৎ লোক আসমান থেকে রেডীমেড নাযিল হয় না। বিদেশ থেকে আমদানী করে আনার জিনিসও এটা নয়। সুপরিকল্পিত উপায়েই সৎ লোক তৈরী করতে হয়।

রাসূল (সা.) মক্কার অসভ্য বর্বর সমাজে আলণ্ঢাহর আইন মানবার দাওয়াত দেবার ফলে যারা এ দাওয়াত কবুল করলেন, তাদেরকেই তিনি সৎ লোক হিসাবে গড়ে তুললেন।

আলণ্ঢাহ পাক মানুষকে যে বিবেকশক্তি দিয়েছেন, তার ফলে যারা মন্দ কাজ করে তারাও মন্দকে মন্দ বলেই জানে। যা ভাল সেদিকে বিবেকের স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। তাই যাদের বিবেক মরে যায়নি, তারা ভাল হয়ে চলার পথ পেলে সে পথে চলতে চায়। দুর্বল মনের লোকেরা সে পথে চলার বাধা দেখে এগুতে সাহস পায় না। সাহসী লোকেরাই হিম্মত করে এগিয়ে আসে। এমন কি তারা এ পথের সকল বাধা উপেক্ষা করে বির"দ্ধ শক্তির সাথে লড়াই করে সততার পথে টিকে থাকে।

রাসূল (সা.)-এর নেতৃত্বে সাহাবায়ে কিরামের মক্কী যুগের তেরটি বছরের সংগ্রামী জীবন এ কথারই সাক্ষী। আলণ্ঢাহর দাসত্ব ও রাসূলের নেতৃত্ব কবুল করে যারা আলণ্ঢাহর আইনের পক্ষে এবং মানুষের মনগড়া আইন উৎখাত করার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করতে গিয়ে বিরোধী শক্তির যুলুম ও নির্যাতন সহ্য করতে রাযী ছিলেন, তারাই মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলেন। সৎ লোকের এ টীম বিনা পরিকল্পনায় ও বিনা চেষ্টায় তৈরী হয়নি। সৎ লোকের শাসন কায়েম করতে হলে আজও ঐ নিয়মেই লোক তৈরী করতে হবে।

সৎ লোক তৈরীর পদ্ধতি

মানুষের দেহসত্তার উপর বিবেকসত্তার নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও প্রধান্য সৃষ্টির জন্য আলণ্ঢাহ পাক যে পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন, তা ছাড়া আর কোন উপায়ে সত্যিকারের সৎ লোক তৈরী করা সম্ভব নয়। সে পদ্ধতির পয়লা বিধান হলো ঈমান। যে সৎ হতে আগ্রহী তাকে পয়লাই তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের উপর ঈমান আনতে হবে। এর সহজ মানে হলো এক আলণ্ঢাহর হুকুম মেনে চলার সিদ্ধান্ড় নিয়ে রাসূল

(সা.)-এর তরীকা মত আলণ্ঢাহর হুকুম এমনভাবে মানতে হবে যেন আখিরাতে আলণ্ঢাহর কাছে দোষী সাব্যস্ড় হতে না হয়।

যে ঈমান আনল, তাকে পাঁচ ওয়াক্ত জামায়াতে নামায ও রমযানের রোযার মাধ্যমে এমন ট্রেনিং নিতে হবে যা তাকে তার দেহের গোলামী থেকে উদ্ধার করে আলণ্ঢাহর গোলামে পরিণত করবে এবং তার দুনিয়াদারীর কাজকেও ইবাদত বানিয়ে দেবে।

দেহের উপর বিবেকের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্জন করতে হলে এ জাতীয় ঈমানদারদেরকে সংগঠনভুক্ত হয়ে সম্মিলিত চেষ্টায় নিজেদের জীবন গড়ে তুলতে হবে। জামায়াতবদ্ধ জীবন ছাড়া অনৈসলামী সমাজের প্রভাব থেকে বেঁচে থাকার কোন উপায় নেই। রাসূল (সা.) -এর নেতৃত্বে সাহাবায়ে কিরাম জামায়াতবদ্ধ না হলে নিজেদেরকে এভাবে গড়তে পারতেন না।

মানুষ সৎ হতে চায়

আমাদের দেশের সব লোকই অসৎ নয়। সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্ড়রে লোকের নেতৃত্ব না থাকা সত্ত্বেও সমাজে এমন যথেষ্ট লোক রয়েছে যারা সৎ থাকার চেষ্টা করে এবং সৎ হবার সুযোগ তালাশ করে।

মাদ্রাসার মাধ্যমে যে বিরাট সংখ্যক উলামা তৈরী হচ্ছেন, তাদের মধ্যে কুরআন-হাদীস অধ্যয়নের কারণেই সৎ থাকার প্রবল আগ্রহ থাকে। সাধারণ শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও অনেকে সৎ হবার ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু অসৎ সমাজ ও পরিবেশ কাউকেই সহজে সৎ থাকতে দেয় না।

প্রায় সকল পর্যায়ের নেতৃত্বেই অসৎ লোকদের প্রাধান্য ও প্রভাব প্রতিপত্তি থাকার কারণে কেউ বিবেকের তাকিদে সৎ থাকার চেষ্টা করলেও এ সংগঠিত অসৎ শক্তির সামনে টিকে থাকতে পারে না। সৎ থাকতে আগ্রহী যারা মাদ্রাসা, খানকা, তাবলীগ ও মসজিদের সীমাবদ্ধ এলাকায় কিছুটা সংগঠিত আছে, তারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ময়দানে অসংগঠিত থাকায় সুসংগঠিত অসৎ নেতৃত্বের মোকাবিলা করতে পারছে না। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে সৎ লোক তৈরী করার ব্যবস্থা না থাকা সত্ত্বেও আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে যারা সৎ থাকতে চায়, তারাও সংগঠিত না হওয়ায় অসৎ নেতৃত্বের সামনে অসহায়।

সৎ লোকেরা যোগ্য হবার সুযোগ পাচ্ছে না

যোগ্য লোকেরা পরিবেশগত বহু কারণে বেশীর ভাগই সৎ থাকতে পারছে না। অথচ সর্বক্ষেত্রে তাদের হাতেই নেতৃত্ব। এরা এত যোগ্যতার সাথে নেতৃত্ব দিচ্ছে যে, সৎ লোকেরা কোথাও পাত্তা পাচ্ছে না। ফলে সৎ লোকেরা এত অযোগ্য থেকে যাচ্ছে যে, তারা নিজের সততাটুকুও হেফাযত করতে পারছে না।

অসৎ লোক যদি যোগ্য হয়, তাহলে যোগ্যতার সাথে অসৎ কাজই করে। আর সৎ লোক যদি যোগ্য না হয়, তাহলে এ সততা কোন কাজেই লাগে না। অসৎ লোকেরা রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজের সকল ময়দানে সুসংগঠিত। আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে যারা সৎ, তারাও এসব ময়দান অসৎ লোকদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। তারা রাজনীতির হাঙ্গামা থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকাই পছন্দ করেন। অসৎ নেতৃত্বের বির"দ্ধে তারা র"খে দাঁড়ান না। যারা মাদ্রাসা, খানকাহ, তাবলীগ ও মসজিদে নিজেদের সততাটুকু নিয়ে কোন রকমে দুনিয়ার জীবনটা কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন, তারা রাজনীতি ও অর্থনীতির ময়দানে কোন স্থান না পাওয়ায় যোগ্যতা সৃষ্টির সুযোগ থেকে বঞ্চিতই হয়ে আছেন। যোগ্যতা কাজের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়। শূন্যে যোগ্যতা সৃষ্টি হয় না। রাজনীতি ও অর্থনীতির ময়দান এবং সমাজের সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেবার দায়িত্ব থেকে দূরে থেকে যোগ্যতা হাসিলের কোন উপায় নেই।

সৎ ও অসতে সংঘর্ষ অনিবার্য

সৎ ও অসৎ বা হক ও বাতিলের মধ্যে সংঘর্ষ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সৎলোকেরা রাজনীতি ও অর্থনীতির ময়দানে অসৎ লোকদের সাথে প্রতিযোগিতায় আসে না। সৎ লোকদের মধ্যে যারা কয়েকটি বিশেষ কর্মক্ষেত্রে তাদেরকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছেন, অসৎ নেতৃত্বের সাথে তাদের কোন সংঘর্ষ হয় না। অসৎ নেতৃত্ব নিশ্চিন্ড় যে, মাদ্রাসা, খানকাহ, তাবলীগ ও মসজিদে যারা আছেন, তারা রাজনৈতিক নেতৃত্ব দখল করতে পারবে না। কারণ তাদের কোন রাজনৈতিক কর্মসূচিই নেই।

দুনিয়ায় বিনা পরিকল্পনা ও বিনা কর্মসূচিতে কোন কাজ সমাধা করা যায় না। উলামায়ে কিরাম তৈরী করা মাদ্রাসার কাজ। আলণ্ঢাহওয়ালা বানানো খানকার দায়িত্ব। আখিরাতমুখী মন তৈরী করা তাবলীগের উদ্দেশ্য। এভাবে যেটুকু কর্মসূচি যেখানে আছে সে অনুযায়ী অবশ্যই লোক তৈরী হচ্ছে। কিন্তু ইকামাতে দীনের জন্য এ কর্মসূচি মোটেই যথেষ্ট নয়। এ কর্মসূচি দ্বারা যেটুকু কাজ হচ্ছে তা অবশ্যই দীনের বিরাট খিদমত।

কিন্তু অসৎ নেতৃত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রের যে বিরাট ময়দান দখল করে আছে, সে ময়দানের জন্য সংগ্রামী বাহিনী তৈরীর উপযোগী পরিকল্পনা ও কর্মসূচি ছাড়া অসৎ নেতৃত্ব উৎখাত করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এ উদ্দেশ্যে মাদ্রাসা, খানকাহ ও তাবলীগে কোন কর্মসূচি নেই বলেই এসবের সাথে অসৎ নেতৃত্বের কোন সংঘর্ষ হয় না। অসৎ নেতৃত্ব তাদেরকে কোন বিকল্প শক্তি বলে গণ্যই করে না। বরং বিভিন্নভাবে তাদের পরোক্ষ সমর্থন নেবার সুযোগও পায়।

অবশ্য মাদ্রাসা, খানকাহ ও তাবলীগে আলণ্ঢাহর আইন চালু করার পরিকল্পনা ও কর্মসূচি থাকলে সেখান থেকেও সংগ্রামী বাহিনী তৈরী হতে পারে। তেমন কর্মসূচি গ্রহণ করলে তাদের সাথেও বাতিল শক্তির সংঘর্ষ হবে।

ইসলামী আন্দোলনই অসৎ নেতৃত্বের একমাত্র চক্ষুশূল

জামায়াতে ইসলামী আলণ্ঢাহর আইন কায়েমের উদ্দেশ্যে একদল সৎ ও যোগ্য নেতা গড়ার এবং জনগণকে আলণ্ঢাহর আইন মানতে সহায়তা করার জন্য চরিত্রবান কর্মী বাহিনী তৈরীর পরিকল্পনা নিয়ে এরই উপযোগী কর্মসূচি অনুযায়ী কাজ করছে বলেই সকল অসৎ নেতৃত্ব জামায়াতকে তাদের জন্য বিরাট হুমকি মনে করে।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা চালু থাকা সত্ত্বেও ইসলামী ছাত্রশিবির যে হারে ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্রে সমৃদ্ধ কাফেলা গড়ে তুলছে, তা অসৎ নেতৃত্বের জন্য রীতিমতো শংকার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ছাত্রশিবিরের বির"দ্ধে আদর্শহীন মহল যুক্তির বদলে শক্তি প্রয়োগ করছে।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষার অশালীন পরিবেশেও ইসলামী ছাত্রী সংস্থা ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে ছাত্রীদের মধ্যে একদল সংগ্রামী মহিলা গড়ে তুলছে বলেই তাদের বির"দ্ধে অপপ্রচার চলছে। অথচ তারা বাস্ড়ব জীবনে একথা প্রমাণ করেছে যে, ইসলামী পর্দা পদ্ধতি উচ্চশিক্ষা, প্রগতি ও আধুনিকতার পথে বাধা নয়।

শ্রমিক অঙ্গনে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মেহনতী মানুষদেরকে পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্রী শোষকদের খপ্পর থেকে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে তাদের মধ্য থেকেই সৎ ও চরিত্রবান নেতৃত্ব সৃষ্টির চেষ্টা করছে। তাই তারাও অসৎ নেতৃত্বের চক্ষুশূল।

ইসলামী আন্দোলনের এ কয়টি সংগঠন দেশের সৎ লোকদের সংগঠিত করে পরিকল্পিত কর্মসূচি অনুযায়ী যোগ্য বানাবার চেষ্টা করছে। আর যোগ্য লোকদেরকে সংগঠিত করে সৎ ও চরিত্রবান হিসাবে গড়ে তুলছে।

যারা সততা নিয়ে টিকে থাকতে চান এবং দেশ থেকে অসৎ নেতৃত্ব উৎখাত করতে চান, তাদেরকে অবশ্যই সুসংগঠিত হতে হবে। জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ছাত্রশিবির, ইসলামী ছাত্রী সংস্থা ও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন এ জাতীয় লোকদেরকে একটি ইতিবাচক শক্তিতে পরিণত করার জন্য অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে।

ইসলামের এ সম্ভাবনাময় শক্তির বির"দ্ধে সকল বাতিল শক্তি যে মারমুখী ভূমিকা পালন করছে এটাই এ কথা প্রমাণ করছে যে, তারা এটাকেই বিপদ বলে গণ্য করে। হক ও বাতিলের এ সংঘর্ষ চির"ন্ড়ন। এ সংঘর্ষ ছাড়া আলণ্ঢাহর আইন কায়েমের যোগ্য লোক বাছাই করা ও গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এটাই আল- াহর বিধান। এ কারণেই নবীগণকে বাতিলের মোকাবিলায় সংগ্রাম করতে হয়েছে।

এ সংগ্রামের মাধ্যমেই এমন একদল লোক তৈরী হবে, যাদের হাতে খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণের জন্য আলণ্ঢাহ পাক সূরা নূরের ৫৫ নম্বর আয়াতে ওয়াদা করেছেন।

সৎ লোক তৈরীর কর্মসূচি

বিনা চেষ্টায় সৎ লোক তৈরী হয় না। অসৎ হওয়ার জন্য চেষ্টা করা লাগে না। সৎ হবার চেষ্টা না করলেই অসৎ হয়ে যায়। যেমন কাপড় নিজে নিজেই ময়লা হতে থাকে। এর জন্য চেষ্টা করতে হয় না। কিন্তু বিনা চেষ্টায় কাপড় সাফ হয় না।

আলণ্ঢাহ তাআলা সৎ লোক তৈরী করার কর্মসূচি দিয়েই নবী ও রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। ঐ কর্মসূচি ছাড়া সত্যিকার অর্থে সৎ লোক তৈরী হতে পারে না।

এ কর্মসূচির দুটো দিক রয়েছে-একটা হলো ইতিবাচক দিক। অপরটি নেতিবাচক। ইতিবাচক দিকে ৪ দফা কর্মসূচি রয়েছে যা কুরআন পাকে সূরা বাকারার ১২৯ ও ১৫১ আয়াত, সূরা আলে ইমরানের ১৬৪ আয়াত ও সূরা জুমআর ২য় আয়াতে উলেণ্ঢখ করা হয়েছে। সূরা জুমআ থেকে উলেণ্ঢখ করছিঃ অর্থাৎ তিনিই ঐ সত্তা যিনি উম্মীদের মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন ঃ

১। আলণ্ঢাহর আয়াতসমূহকে তাদের সামনে তিলাওয়াত করেন,

২। তাদের জীবনকে পাক-পবিত্র করেন,

৩। তাদেরকে আলণ্ঢাহর কিতাব শিক্ষা দেন,

৪। তাদেরকে হিকমত শিক্ষা দেন।

এ ৪ টি কাজের সামান্য ব্যাখ্যা দরকার

১। রাসূল (সা.) হযরত জিব্রাঈল (আ.)-এর কাছ থেকে যেভাবে তিলাওয়াতের মাধ্যমে কুরআন শিখেছেন, তেমনি তিনিও সাহাবাগণকে তিলাওয়াত করে শুনিয়েছেন। লেখা বা অন্য কোন উপায়ে উচ্চারণ শেখান যায় না। এ কারণে শুদ্ধ করে তিলাওয়াত করা কুরআন শেখার পয়লা জর"রী কাজ।

২। দ্বিতীয় কাজ ছিল সাহাবা কিরামের জীবন থেকে আলণ্ঢাহর অপছন্দনীয় সব কথা, কাজ ও অভ্যাস দূর করে তাঁদেরকে পবিত্র করা। রাসূল (সা.) তাঁদের প্রতি সব সময় লক্ষ্য রাখতেন (তাওয়াজ্জুহ)। যখনই তেমন কিছু লক্ষ্য করতেন যা সংশোধন করা দরকার, তখনই হিদায়াত দিতেন। এ কারণেই যেসব বিষয়ে তিনি আপত্তি করেননি তা সঠিক বলে গণ্য হতো। আর এ জন্যই রাসূল (সা.) -এর "তাকরীর" (অনুমোদন)-কেও হাদীস হিসাবে স্বীকার করা হয়।

৩। তৃতীয় কাজ ছিল কুরআন শিক্ষা দেয়া। রাসূল (সা.) আলণ্ঢাহর পক্ষ থেকে কুরআনের একমাত্র সরকারী ব্যাখ্যাদাতা। শুধু তিলাওয়াত করে শুনিয়ে দিলেই তাঁর দায়িত্ব পূর্ণ হতো না। আলণ্ঢাহর কিতাবের মর্ম ও সঠিক অর্থ বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্বও তিনি পালন করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যাই একমাত্র সঠিক ব্যাখ্যা। এ ব্যাখ্যার বিরোধী কোন ব্যাখ্যাই শুদ্ধ বলে গণ্য হতে পারে না। যুগে যুগে নতুন নতুন যত

ব্যাখ্যা করা হোক এমন কোন ব্যাখ্যা সঠিক বলে মানা যাবে না যা রাসূল (সা.)-এর ব্যাখ্যার সাথে খাপ খায় না।

৪। চতুর্থ কাজ ছিল "হিকমত" শিক্ষা দেয়া। রাসূল (সা.) নিজেই হিকমত অর্থ করেছেন- "তাফাক্কুহ ফি'দ-দীন"। অর্থাৎ দীন সম্পর্কে এতটা স্পষ্ট ধারণা দান করা যাতে তারা জীবনের সবক্ষেত্রে কুরআনের শিক্ষার আলোকে চলার যোগ্য হন। "তাফাক্কুহ" শব্দটি "ফিকহ" শব্দ থেকে গঠিত। ফিকাহর ইমামগণ দীনের স্পষ্ট ধারণা রাখতেন বলেই সব মাসায়েলের সঠিক জওয়াব তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী বাস্ড়ব জীবনে চলতে হলে "তাফাক্কুহ ফি'দ-দীন" জর"রী।

বাতিল শক্তির পক্ষ থেকে যত রকম বাধার সৃষ্টি করা হয় এবং যত প্রকার অন্যায়-অত্যাচার চালান হয় এসবকে অগ্রাহ্য করে হকের উপর মজবুত হয়ে টিকে থাকাই নেতিবাচক কর্মসূচি। উপরোক্ত চার দফা শিক্ষাসূচি অনুযায়ী সাহাবা কিরামকে গড়ে তুলবার সাথে সাথে নেতিবাচক দিক দিয়ে বাতিলের মুকাবিলায় যুলুম-নির্যাতন সহ্য করে হকের উপর মজবুত থাকার শিক্ষা দেয়া না হলে সত্যিকার মুজাহিদ হিসাবে তারা গড়ে উঠতেন না। আলণ্ঢাহর আইন কায়েমের আন্দোলনে যারা সাড়া দিলেন, তাদেরকে শক্তির দাপটে দমন করার জন্য অসৎ নেতৃত্ব চেষ্টা করবেই। যারা এসব বাধার পরওয়া না করে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার হিম্মত করে তাদের মধ্য থেকেই সৎ নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়।

উপরোক্ত ৪ দফা ইতিবাচক শিক্ষা মাদ্রাসা, খানকাহ ও তাবলীগের মাধ্যমে যেটুকু হচ্ছে তার সাথে নেতিবাচক শিক্ষা যোগ না করলে সৎ লোক তৈরীর আসল উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে না। আলণ্ঢাহর আইন কায়েমের উদ্দেশ্যে জিহাদী জযবা নিয়ে আন্দোলনের কর্মসূচি দেয়া না হলে বাতিলের পক্ষ থেকে কোন বাধা আসে না। হক ও বাতিলের সংঘর্ষ সম্পর্কে কুরআন পাকে যত নির্দেশ দেয়া হয়েছে, মাদ্রাসা, খানকাহ ও তাবলীগের প্রচলিত কর্মসূচিতে তা পালন করার কোন সুযোগ আসে না।

অথচ বাতিলকে উৎখাত করে অসৎ নেতৃত্বের জায়গায় সৎ নেতৃত্ব কায়েম করতে হলে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় কর্মসূচিই সমানভাবে চালিয়ে যেতে হবে। জামায়াতে ইসলামী এ পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচির মাধ্যমেই লোক তৈরী করছে।

সৎ লোকের শাসন

উপরোক্ত ইতিবাচক ও নেতিবাচক কর্মসূচীর মাধ্যমে তৈরী লোকদের হাতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব আসলেই সৎ লোকের শাসন কায়েম হয়েছে বলে বুঝা যাবে এবং একমাত্র তখনই আলণ্ঢাহর আইন চালু হওয়া সম্ভব হবে। সমাজ থেকে এ জাতীয় লোক ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমেই যোগাড় হয়ে থাকে।

যে সমাজে ইসলাম কায়েম নেই ঐ সমাজ থেকেই এ ধরনের লোক তালাশ করা সহজ। সমাজে ইসলাম কায়েম না থাকা সত্ত্বেও যারা ইসলামের জন্য দরদী হয়ে আন্দোলনে যোগদান করে, তারা ইসলাম বিরোধী শক্তির বাধা-বিপত্তির মুকাবিলা করতে গিয়ে বহু রকমের ত্যাগ ও কুরবানী দিতে বাধ্য হয়। এমনকি তাদের জীবনও বিপন্ন হয়ে পড়ে। এ সত্ত্বেও যারা আলণ্ঢাহর পথে মজবুত হয়ে টিকে থাকে, তারা একথাই প্রমাণ করে যে, তারা দীনের স্বার্থে সবকিছু ত্যাগ করতে পারে- তারা কোন অবস্থায়ই দীনের পথ ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়।

এ ধরনের লোকদের হাতে যদি শাসন ক্ষমতা আসে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তারা দীন কায়েম করতে চেষ্টা করবে। তারা দুনিয়ার স্বার্থ হাসিল করার জন্য আলণ্ঢাহর আইন অমান্য করবে না, ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে অন্যায় ও অবিচার করবে না, সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও হারাম পথে টাকাওয়ালা হবার চেষ্টা করবে না, অন্য লোকদের হক নষ্ট করে স্বজনপ্রীতি করবে না এবং আখিরাতের লাভ বাদ দিয়ে দুনিয়ার স্বার্থ হাসিলের চিন্ড়া করবে না। কারণ ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের মন, মগজ ও চরিত্র এমনভাবে

গড়ে ওঠে যে, তারা দুনিয়ার লাভকে আখিরাতের চেয়ে বড় মনে করে না। যদি তাই করত, তাহলে আন্দোলনের জীবনে তারা দুনিয়ার সুবিধার জন্য বাতিলের সাথে আপোস করতে রাযী হতো।

আলণ্ঢাহর আইনের সুফল

রাসূল (সা.) মদীনায় ইসলামী সরকার গঠন করার পর একে একে আলণ্ঢাহর আইন চালু করায় সবাই যখন এর সুফল নিজের চোখে দেখতে পেল, তখন মদীনার বাইরেও আরব দেশের সব জায়গায় জনগণ দলে দলে ইসলাম কবুল করতে লাগল। এটাই স্বাভাবিক ছিল। কেননা সব মানুষই সুখ-শান্ড়িতে থাকতে চায়। তারা আলণ্ঢাহর আইন চালু হবার আগে সমাজে অশান্ড়ি ও বিশৃঙ্খলার যাতনা সহ্য করেছে। আলণ্ঢাহর আইন জারী হবার পর তারা এর সুফল দেখে সহজেই বুঝতে পারল যে, দুনিয়ার জীবনে যতটুকু সুখ-শান্ড়ি ইসলামী রাষ্ট্রে পাওয়া গেল তা এর আগে কখনও তারা পায়নি।

কিন্তু আলণ্ঢাহর আইন নিজে নিজেই চালু হতে পারে না। রাসূল (সা.) তের বছর চেষ্টা করে যে একদল সৎ লোক তৈরী করেছিলেন, তাদের হাতেই আলণ্ঢাহর আইন জারী হলো এ লোকগুলো ইসলাম বিরোধীদের যুলুম-অত্যাচার সহ্য করে এবং সব রকম বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে একমাত্র আখিরাতে আলণ্ঢাহর মেহেরবানী ও বেহেশত পাওয়ার আশায় নিজেদেরকে ঈমান, ইলম ও আমল দ্বারা গড়ে তুলেন। দুনিয়ার আরাম আয়েশের লোভ থাকলে তারা এত কষ্ট সহ্য করতে রাযী হতেন না।

যখন এ ধরনে সৎ লোকের শাসন কায়েম হয়, তখন তারা ইখলাসের সাথে আলণ্ঢাহর আইন জারী করে। তারা কাজে ফাঁকি দেয় না। ঘুষ খায় না। যার যা হক তা যাতে সবাই পায় সেজন্য চেষ্টা করে। যারা আলণ্ঢাহর আইন অমান্য করে, তাদেরকে শক্ত হাতে পাকড়াও করে সংশোধন করার ব্যবস্থা করে। যারা সংশোধন হয় না, তাদেরকে আলণ্ঢাহর আইন অনুযায়ী কঠোর শান্ড়ি দেয়। ফলে চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাস, ঘুষ এবং সব রকম দুর্নীতি সমাজ থেকে উৎখাত হয়ে যায়। তখন মানুষ নিরাপদে জীবন যাপন করে এবং সুখে শান্ড়িতে বসবাস করার সুযোগ পায়।

মানুষের সুখ-শান্ড়ির জন্য দুটো বিষয় সবচেয়ে জর"রী বলে সবাই স্বীকার করতে বাধ্য ঃ

১। বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান ও চিকিৎসার নিশ্চয়তা হলো মানুষের সবচেয়ে গুর"ত্বপূর্ণ বিষয়। হালাল পথে র"যী-রোযগার করার মাধ্যমে এসব প্রয়োজন পূরণের সুযোগ সব মানুষ যাতে পায় সে ব্যবস্থা করা ইসলামী সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

রিযকের মালিক আলণ্ঢাহ পাক। ইসলামী সরকারকে তাঁরই খলীফা হিসাবে এ বিষয়ে দায়িত্ব পালন করতে হয়। র"যী-রোযগারের সুযোগ দেবার পরও অনেক কারণে যাদের ঐ সব মৌলিক প্রয়োজনের অভাব থেকে যায়, তাদের জন্য বাইতুল মাল থেকে ব্যবস্থা করার দায়িত্বও সরকারের।

২। জান, মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা হলো ইসলামী সমাজের আর একটি গুর"ত্বপূর্ণ বিষয়। অন্যায়ভাবে ও বেআইনীভাবে কারো জান, মাল ও ইজ্জতের উপর যাতে কেউ হামলা করতে না পারে এর নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্বও সরকারের। সৎ লোকের শাসন ছাড়া এ নিরাপত্তা সম্ভব নয়।

জান, মাল ও ইজ্জতের উপর যুলুম বন্ধ করার একমাত্র পথই হলো সুবিচার ও ইনসাফ কায়েম করা। বর্তমানে ইউনিয়ন থেকে রাজধানী পর্যন্ড় দেশের সর্বত্র হাজারো রকমের অপরাধ হচ্ছে। সৎ লোকের শাসন না থাকায় অপরাধীরা শান্ড়ি পাচ্ছে না। অপরাধীদের দাপটে ভাল মানুষরা ভয়ে অস্থির। অসৎ শাসনের কারণে দুষ্টের লালন ও শিষ্টের দমনই সমাজে চালু হয়ে গেছে। সৎ লোকের শাসন ছাড়া এ মুসিবত থেকে নিস্ড়ার পাওয়ার কোন উপায় নেই।

ইসলামী সরকারের চার দফা দায়িত্ব

আল- াহ পাক সূরা আল হাজ্জ-এর ৪১ নং আয়াতে মযলুম ও নির্যাতিত সাহাবা কিরাম সম্পর্কে মন্ড়ব্য করে বলেন, "এরা ঐসব লোক যাদেরকে যদি আমি যমীনে ক্ষমতা দান করি, তাহলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত ব্যবস্থা চালু করবে, সৎ কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে।"

এ আয়াত নাযিলের পরপরই রাসূল (সা.) মদীনায় হিজরত করেন এবং সাহাবা কিরামকে নিয়ে ইসলামী সরকার গঠন করে ঐ আয়াত অনুযায়ী ৪ দফা দায়িত্ব পালন করেন।

প্রথম দায়িত্ব হলো জনগণের চরিত্র গঠন। এর জন্য নামাযের চেয়ে বড় মাধ্যম আর কিছুই হতে পারে না। নামাযের উদ্দেশ্যই হলো মানুষকে আলণ্ঢাহর গোলামীতে অভ্যস্ড় করা। তাই আল- াহ সূরা আনকাবুতের ৪৫নং আয়াতে বলেন, "নিশ্চয়ই নামায অশণ্টীল ও খারাপ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে।"

দ্বিতীয় দায়িত্ব হলো জনগণের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করা। যাকাতের উদ্দেশ্যই হলো সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করা। ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তিই হলো যাকাত। যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতিই জনগণের ভাত-কাপড়-বাসস্থান-চিকিৎসা ও শিক্ষার নিশ্চয়তা দিতে পারে।

তৃতীয় দায়িত্ব হলো সমাজের জন্য আলণ্ঢাহ পাক যা কিছু ভাল বলে জানিয়ে দিয়েছেন তা সরকারী ক্ষমতা ব্যবহার করে জনগণের মধ্যে চালু করা। শুধু ওয়ায ও নসীহত এ উদ্দেশ্যে যথেষ্ট নয়। যাদের উপর আদেশ ও নির্দেশ দেবার দায়িত্ব রয়েছে, তাদের যথাযথ ভূমিকা ছাড়া এ উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে না।

চতুর্থ দায়িত্ব হলো সমাজ থেকে সব রকমের মন্দ কাজ খতম করা। ওয়ায-নসীহত দ্বারা এ কঠিন উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। সরকারী ক্ষমতা প্রয়োগ করে মন্দকে সমাজ থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে তা সম্ভব নয়।

আমাদের দেশে যদি উপরোক্ত চার দফা দায়িত্ব পালনের যোগ্য সরকার কায়েম হয়, তবেই মানুষ সুখে-শান্ড়িতে জীবন কাটাবার সুযোগ পাবে। তাই আলণ্ঢাহর আইন ও সৎ লোকের শাসনের কোন বিকল্প নেই।

আলণ্ঢাহর আইনের পক্ষে গণদাবী চাই

ইংরেজ শাসকদের সময় থেকে এ পর্যন্ড় যারা দেশের সরকারী ক্ষমতা পেয়েছে, তারা সবাই নিজেদের মনগড়া আইনই চালু করেছে। তারা যদি আলণ্ঢাহর আইন পছন্দ করতো, তাহলে দেশের এ দুর্দশা হতো না। যারা আইন তৈরী করে তারা নিজেদের স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধা বহাল রাখারই চেষ্টা করে। তারা নিরপেক্ষ হয়ে সব মানুষের জন্য উপকারী আইন রচনা করতে পারে না।

একমাত্র আলণ্ঢাহই এমন এক মহান সত্তা যার নিজের স্বার্থ নেই। তিনিই একমাত্র নিরপেক্ষ। তাছাড়া সব বিষয়ে ইলম থাকার কারণে তাঁর কোন ভুল হয় না। তাই আলণ্ঢাহ পাক বলেন, "তোমরা যেটা

অপছন্দ করছ হয়তো সেটা তোমাদের জন্য ভাল এবং যেটা পছন্দ করছ হয়তো সেটাই তোমাদের জন্য মন্দ। আর আলণ্ঢাহই বেশী জানেন, তোমরা জান না।" (সূরা বাকরাহ-২১৬ আয়াত)।

এ কারণেই মানব রচিত আইন দ্বারা কোন কালেই মানুষের সুখ-শান্ড়ি হতে পারে না। বার বার আইন বদলান হলেও অশান্ড়ি দূর হয় না। তাই যুগে যুগে নবী ও রাসূল পাঠিয়ে তাঁদের মারফতে "আলণ্ঢাহর আইন" নাযিল করা হয়েছে। তাঁরা সমাজ থেকে একদল সৎ লোক তৈরী করে আলণ্ঢাহর আইন জারী করার চেষ্টা করেছেন। শেষ নবী (সা.) তের বছর চেষ্টা করে একদল সৎ লোক যোগাড় করে তাদেরকে সাথে নিয়ে মদীনায় আলণ্ঢাহর আইন চালু করলেন। দুনিয়া দেখতে পেল যে, "আলণ্ঢাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন" কায়েম হলে একটা অসভ্য ও বর্বর জাতি কিভাবে মানব জাতির সভ্যতার উস্ড়াদে পরিণত হয়।

বাংলাদেশের জনগণ যদি বর্তমান অশান্ড়ি, সন্ত্রাস, অবিচার ও দুর্দশা থেকে বাঁচতে চায় তাহলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আওয়াজ তুলতে হবে- "আলণ্ঢাহর আইন চাই, সৎ লোকের শাসন চাই।" এ গণদাবী ব্যাপক হলে সরকার আলণ্ঢাহর আইনের বিরোধিতা করতে সাহস করবে না।

যারা আলণ্ঢাহর আইন চায় তাদেরকে
সংগঠিত হতে হবে

এদেশের মুসলিম জনগণ আলণ্ঢাহকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, আলণ্ঢাহর কুরআনকে অন্ড়র দিয়ে ভক্তি করে এবং আলণ্ঢাহর রাসূল (সা.)-কে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। তাই তারা চায় যে কুরআনের আইন চালু হোক এবং রাসূলের (সা.) দেয়া শান্ড়ির বিধান জারী হোক। দেশের অমুসলিমরাও সুখ-শান্ড়ি চায়। আল- াহর আইন চালু হলে তাদের জীবনেও যে শান্ড়ি আসবে সে কথা তাদেরকে বুঝালে বুঝবে। আলণ্ঢাহর আইনে দেশ চললে তারাও শান্ড়িতে তাদের ধর্ম পালন করতে পারবে।

জনগণ যতই আলণ্ঢাহর আইন পছন্দ কর ক তা নিজে নিজেই কায়েম হবে না। এর জন্য চাই গণ ঐক্য। জনগণ আলণ্ঢাহর আইন ও সৎলোকের শাসনের পক্ষে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ না হলে শুধু মনে মনে চাইলেই তা চালু হবে না। এ মহান উদ্দেশ্যে যে জামায়াত আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে, সে জামায়াতের পরিচালনায় জনগণ যখন সংগঠিত হবে, তখনই জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা সত্যিকারভাবে পূরণ হওয়া সহজ হবে।

আলণ্ঢাহর আইন কায়েম হলে যারা তাদের ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত, শ্রেণীগত ও দলগত স্বার্থ নষ্ট হবে বলে মনে করে, তাদেরকেই কায়েমী স্বার্থ বলা হয়। কুরআনে তাদেরকে 'তাগূত' বলা হয়েছে এবং তাগূতী শক্তি মানুষকে আলণ্ঢাহর গোলাম হতে বাধা দেয় এবং তাদের মরযীর গোলাম বানিয়ে রাখার চেষ্টা করে। মানুষের গোলামী থেকে মুক্তি পেতে হলে জনগণকে সংঘবদ্ধ হয়ে তাগূতী শক্তির বির দ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

নির্বাচনের মাধ্যমেই ইসলামী
সরকার কায়েম করতে হবে

আলণ্ঢাহর রাসূল (সা.) মদীনার জনগণের সমর্থন নিয়েই ইসলামী সরকার গঠন করেছিলেন। তিনি অস্ত্র ও সেনাবাহিনী নিয়ে মদীনা দখল করেননি। মদীনায় ইসলামী হুকুমাত কায়েম হবার পর মক্কা থেকে কাফির ও মুশরিক বাহিনী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যখন মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রটিকে ধ্বংস করার জন্য আক্রমণ করতে আসল, তখন বদরের ময়দানে রাসূল (সা.) সাহাবা কিরামকে নিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য হন। কিন্তু তিনি মদীনার জনগণের উপর জবরদস্ড়ি করে সরকার কায়েম করেননি।

তাই জামায়াতে ইসলামী শক্তি প্রয়োগ করে এবং অস্ত্র ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে সরকারী ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করে না। আলণ্ঢাহর রাসূল যেমন মদীনাবাসীদের সমর্থন নিয়েই সেখানে ইসলামী হুকুমাত কায়েম করেছেন সে নিয়মেই জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশে ইসলামী সরকার গঠন করতে চায়।

বর্তমানে সারা দুনিয়ায় নির্বাচনই জনগণের সমর্থন যাচাই করার একমাত্র সহজ ও শান্ড়িপূর্ণ উপায়। তাই জামায়াতে ইসলামী নির্বাচনের মাধ্যমেই দেশে ইসলামী সরকার কায়েম করতে চায়। যারা নির্বাচনে বিশ্বাসী, তারা অস্ত্র নিয়ে রাজনীতি করে না। যারা সন্ত্রাসের মাধ্যমে ভোটকেন্দ্র দখল করে নির্বাচনে জিতবার চেষ্টা করে, তারা জনগণের উপর আস্থা রাখে না। তারা জনগণের সমর্থনে জিতবার আশা করে না বলেই জোর করে ভোট কেন্দ্র দখল করে ও ব্যালট ডাকাতি করে।

ব্যালট ডাকাতরা জনগণের দুশমন। তারা জনগণকে স্বাধীনভাবে তাদের মরযী মতো ভোট দিতে বাধা দেয়। ১৯৯১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী যে নির্বাচন হয়েছে তাতে জনগণ মোটামুটি তাদের ইচ্ছা মতো ভোট দিতে পেরেছে। কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় ঐ নির্বাচন হওয়ায় ভোটাররা ব্যালট ডাকাতদের খপ্পর থেকে বাঁচতে পেরেছে।

জামায়াতে ইসলামীর সরকার কায়েম করতে হবে

এ কথা সবাই জানে যে, এ পর্যন্ড় যে সব দল দেশ শাসন করেছে, তাদের কারো আলণ্ঢাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমের কোন কর্মসূচিই নেই। তারা এ জাতীয় কথাও বলেন না। আলণ্ঢাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম করতে হলে কমপক্ষে তিনটি কাজ করতে হবে ঃ

১। ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষিত মহলকে স্পষ্ট জ্ঞান দান করতে হবে। কালেমা তাইয়্যেবার বিপণ্ঢবী দাওয়াত, নামায-রোজা-হজ্জ-যাকাতের মতো বুনিয়াদী ইবাদতসমূহের হাকীকত ও উদ্দেশ্য এবং ইসলামী রাজনীতি ও অর্থনীতিসহ জীবনের সব ক্ষেত্রে ইসলামী বিধানের জ্ঞান আধুনিক যুগের উপযোগী ভাষায় পরিবেশন করতে হবে, যাতে দুনিয়ার আর সব মত ও পথের সাথে তুলনা করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা সম্ভব হয়।

উচ্চ শিক্ষিত ও সুধী মহলের নিকট কুরআন পাককে এমনভাবে উপস্থাপন করার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তারা কুরআন মজীদকে সকল জ্ঞানের উৎস মনে করতে সক্ষম হন এবং ইসলামী সমাজ বিপণ্ঢবের দিশারী ও গাইড বুক হিসাবে কুরআন হাকীমকে বুঝতে পারেন।

এ জাতীয় জ্ঞান চর্চার দ্বারাই মানুষ আলণ্ঢাহর আইনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে।

২। আলণ্ঢাহর আইন কায়েমের কঠিন দায়িত্ব পালনের যোগ্য এমন একদল লোক তৈরী করতে হবে, যারা ইসলামকে জানে এবং নিজেদের জীবনে ইসলামকে মেনে চলে। তাদের মন, মগজ, চরিত্র, অভ্যাস, চালচলন, আচার, ব্যবহার ইত্যাদি কুরআন ও হাদীস মুতাবেক গড়ে তুলতে হবে। এ মহান উদ্দেশ্যে ঐ সব লোককে সংগঠিত করতে হবে যারা নিজেদেরকে দীন কায়েমের যোগ্য বানাতে চায়।

৩। এভাবে যে সব লোক তৈরী হতে থাকে তাদের মধ্যে ঈমান, ইলম ও আমলের দিক দিয়ে যারা অগ্রসর, তাদের হাতেই সংগঠনের নেতৃত্বের দায়িত্ব দিতে হবে। ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে এ ভাবেই একদল সৎ ও যোগ্য নেতা তৈরী হবে।

সাধারণত দেখা যায় যে, টাকার জোরে বা বিভিন্ন ধরনের প্রভাব, প্রতিপত্তির কারণে অসৎ, চরিত্রহীন, ক্ষমতালোভী ও দুর্নীতিবাজ লোকেরাও নেতা হয়ে জনগণের উপর শোষণ ও যুলুম করে। এ জাতীয় নেতাদের খপ্পর থেকে জনগণকে উদ্ধার করতে হলে সৎ, যোগ্য ও চরিত্রবান লোকদের নেতৃত্ব কায়েম করতে হবে। এ কারণেই সৎ লোকের শাসন কায়েমের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে নেতৃত্বের উপযোগী লোক তৈরী করতে হবে।

উপরে বর্ণিত তিনটি কাজ জামায়াতে ইসলামী বহুদিন থেকে করছে বলেই আজ ইসলাম ও কুরআনের চর্চা এত ব্যাপক হয়েছে, সকল মহলেই ইসলামী জ্ঞানের চর্চা বেড়ে চলেছে এবং ইসালামী মন-মগজ চরিত্রের লোকের সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

যদি দেশবাসী আলণ্টাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন চায় তাহলে তাদের এ আশা তখনই পূরণ হবে, যখন জামায়াতে ইসলামীর হাতে দেশ পরিচালনার ক্ষমতা আসবে।

নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণই ফায়সালা করে যে কাদের হাতে ক্ষমতা দেয়া উচিত। ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারীতে ভোটের দ্বারা জনগণ জাতীয় পার্টি ও আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা না দিয়ে বি.এন.পি'র হাতে দিয়েছে। জনগণ যদি আলণ্টাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন চায়, তাহলে তারা ভোটের দ্বারাই জামায়াতে ইসলামীর হাতে ক্ষমতা তুলে দেবে।